ইউনিট-০১

তুলনামূলক শিক্ষার পরিচিতি
[Introduction of Comparetive Education]

ভূমিকা

তুলনামূলক শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা হিসেবে স্বীকৃত। কার্যত উনবিংশ শতাব্দীতে এ শিক্ষার চর্চা শুরু হয়। বহু মনীষীর চিন্তা এবং পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এ শিক্ষার ভিত্তি রূপে পরিচিত।

সব দেশেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো নাগরিকদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার বিকাশ সাধন যাতে তারা পরবর্তীতে সমাজ এবং দেশের আর্থিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। সেজন্য সমাজকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে যেকোন দেশে এ শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে লক্ষ্যের দিক থেকে তেমন পার্থক্য না থাকলেও শিক্ষার কাঠামো ও ব্যবস্থার দিক থেকে দেশে দেশে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। মূলত প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র্যতা শিক্ষার প্রকৃতি এবং ধারা নির্ণয় করে। তাই জনগণের প্রাকৃতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নয়নের স্তর এবং মান তথা সামগ্রিকভাবে উক্ত সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি শিক্ষার গতি প্রবাহ নির্ধারণ করে। সুতরাং কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অধ্যয়ন করতে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সার্বিক পর্যালোচনা আবশ্যক। আবার বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে হলে সেসব দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। তবে এসবের বিচার বিশ্লেষণে ভাবাবেগ বা পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাব পরিহার পূর্বক উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অপর দেশের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে উপলব্ধি ও অধ্যয়ন করা বাঞ্ছনীয়।

তুলনামূলক শিক্ষার অর্থ

প্রাথমিক স্তরে তুলনামূলক শিক্ষা বলতে বুঝায় বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যের গ্রন্থনাকে। যেমন-

১. ১৮৮১-১৯ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কের অধ্যাপক জন গ্রীসকস ইউরোপ পরিভ্রমণের পর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি এবং হল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর "A year in Europe" নামে এক দীর্ঘ বিবরণী প্রকাশ করেন।

২. ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে দর্শনের অধ্যাপক ভিকটর কজিন প্রুশিয়া সফরে যান এবং তাঁর "Report in the Public Instruction in Prussia-র মাধ্যমে প্রুশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার এক প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেন।

৩. ১৮৫৯ এবং ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ম্যাথু আরনল্ড ফ্রান্স ও জার্মানি পরিভ্রমণ করেন ও এ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ পূর্বক জাতীয় চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটনে উদ্যোগী হন।

৪. মাইকেল স্যাডলার ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তুলনামূলক শিক্ষা চিন্তার ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন তাঁর "How far can we learn anything of practical value from the study of foreign systems of Education" নামক গ্রন্থে। ১৮৯৮-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় Special Reports on Educational Subjects.

৫. ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ক্যান্ডেলের "Educational year book of the International Institute" এবং "The year book of Education".

৬. ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার হোরেস ম্যান তাঁর Seventh Report প্রকাশ করেন এবং এ বিবরণীতেই সর্বপ্রথম দেখা যায় ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং হল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার এক তুলনামূলক আলোচনা। এ বিবরণী সম্পর্কে অধ্যাপক নিকোলাস হানস বলেন ঃ This report, perhaps, was the first attempt at assessing educational values, but it was almost entirely devoted to comparison of school organization and methods of instruction.

৭. ১৯৯১-৯৩ খ্রিস্টাব্দে পাঁচটি খণ্ডে মনরোর "Cyclopedia of Education" প্রকাশিত হয়।

এসব প্রকাশনায় বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংকলিত ছিল। তুলনামূলক শিক্ষাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে অধ্যাপক নিকোলাস হানস, জার্মান অধ্যাপক Freidrich Schneider, ডোভার উইলসন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আর্থসামাজিক অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গিজনিত পার্থক্যের কারণে এক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অন্য দেশের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ বা অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তবে স্ব-স্ব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে নিরলস প্রচেষ্টা, ব্যর্থতা ও সাফল্যের ইতিহাস রয়েছে তা যথাযথ অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রশাসকগণ নিজ নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গুণাগুণ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

আধুনিক জাতিগুলো তারা নিজেদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে, কাঠামো নির্ধারণ ও বিন্যাসে শুধু স্বকীয় ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, তারা অন্যান্য জাতির শিক্ষা সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণে আগ্রহী। তাছাড়াও এসব জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, শিল্প-বিজ্ঞান, আচার-ব্যবহার, ধর্ম, শিল্পকলা, কিভাবে শিক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছে এবং হচ্ছে, কিভাবে তাদের জাতীয় লক্ষ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে বা হচ্ছে, এসব অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান করে যেকোন জাতি তার শিক্ষাকে নিজস্ব কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির মানদণ্ডে বিচার পূর্বক ভবিষ্যতের শিক্ষা উন্নয়ন ও সংস্কারের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষার স্বরূপ ও গতি

শিক্ষা সংস্কারের বা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের কোন পর্যায়ে রয়েছে তা পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশন করে আপন দেশের আর্থসামাজিক উন্নতি সাধনও সম্ভব।

প্রাক শিল্প বিপ্লব যুগে ধীর গতিতে শিক্ষার বিকাশ ঘটত। বর্তমানের মানুষ নিজের ওপর অত্যন্ত আস্থাশীল। বিজ্ঞানের অবদানকে ব্যবহার করে সমাজ ব্যবস্থায় তারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্পকে ব্যবহার করে অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এ দ্রুত পরিবর্তনশীল সভ্যতার গতির সঙ্গতি বিধান করতে হলে সমাজ ব্যবস্থায়ও অনুরূপ গতিশীলতা আনয়ন আবশ্যক। বিজ্ঞানীদের ধারণা, অতিশীঘ্রই বিজ্ঞান মানুষকে উন্নয়নের আর একধাপ ওপরে এগিয়ে নিবে। তাতে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যন্ত্র সভ্যতার ওপর বেশির ভাগই নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। সেজন্য সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিতভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

শিল্পবিজ্ঞান, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনের দিক দিয়ে উন্নত সভ্য দেশগুলো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। অপর দিকে অনুন্নত দেশগুলো পড়ে আছে অনেক পেছনে। কিন্তু এ অনুন্নত এবং দরিদ্র জাতিগুলো উন্নতির প্রত্যাশী। তাই তারা উন্নত দেশগুলোর ন্যায় নিজেদের দেশের সামাজিক পরিবর্তন সাধনে নতুনভাবে শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়নের প্রচেষ্টায় রত। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।

সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষার চাহিদা সবযুগেই পরিলক্ষিত। তাই লক্ষ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই শিক্ষাব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং করছে। তবে রাষ্ট্র বা সরকার ব্যতিত অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাও অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। কোন কোন দেশে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় প্রশাসনভুক্ত, আবার কোথাও বা এটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কিংবা ওপর ন্যাস্ত। এসব দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ভার রাষ্ট্র বা বেসরকারি সংস্থা কিংবা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যার ওপরই দায়িত্ব অর্পিত থাকুক না কেন প্রায় দেশই নিজেদের সাধ্য অনুসারে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় করতে দেখা যায়।

অতীতে শিক্ষা সমাজের যে প্রয়োজন মিটাত বর্তমানে তার পরিসর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্প বিপ্লবের যুগে শিক্ষা শুধু সমকালীন প্রয়োজনই মিটায় না, ভবিষ্যত সমাজের গতিনির্দেশক রূপে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত দেখা যায়, অনুন্নত জাতিগুলো উন্নত সমাজের শিক্ষার প্রেক্ষিতে নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা করতে চায়। এমনকি উন্নত দেশগুলোও পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে একে অন্যের শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যায়নে আগ্রহী। সুতরাং এটি উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষার তুলনামূলক অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ ক্রমেই প্রাধান্য পাচ্ছে।

কোন দেশের শিক্ষা তার জনগণের অনেকের জন্য সীমিত হলেও শিক্ষার কোন দিকের সংস্কার করতে হলে তা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে করতে হবে। নতুবা এ প্রচেষ্টাকে বর্তমানে শিক্ষাবিদগণের কাছে ততটা সম্মানজনক বলে বিবেচিত হবে না।

পরিবর্তনশীল জগতে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় প্রায় জাতিই অংশ গ্রহণ করে থাকে। উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা যে ভূমিকা পালন করছে সেসব দৃষ্টান্ত হতে পৃথিবীর উন্নয়নশীল ও নতুন রাষ্টগুলো নিজেদের প্রগতি সাধনের অনুপ্রেরণা পাচ্ছে। এসব জাতি তাদের গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক সমাজকে পৌরসভায় রূপান্তরিত এবং তাদের গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে শিক্ষাকে প্রধান হাতিয়ার রূপে বিবেচনা করে।

কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে সেই দেশের উন্নতির মূলে কাজ করে তা বিশ্লেষণের জন্য দেশের সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদসহ শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যয়নের বিষয় রূপে গণ্য করেন। সম্ভবত অন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অধ্যয়নের এ প্রবণতা হতে আধুনিক যুগে তুলনামূলক শিক্ষার সূত্রপাত। তাছাড়া এ যুগের মানুষ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে। এ অনিশ্চয়তা দূরীকরণের কোন সুনির্দিষ্ট উপায় না থাকলেও এটি প্রশমনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একক প্রচেষ্টায় কোন কাজে এক রাষ্ট্রের পক্ষে শিক্ষাকে সঠিক ও সার্বিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে যথারীতি পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সমাজ ও শিক্ষার ধারণা উপলব্ধি সম্ভব। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর শিক্ষা ও সমাজকে তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করে এ প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আধুনিক সমাজের প্রয়োজন শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা পুনর্গঠন এবং সংস্কারের জন্য বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যস্থা অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক।

তুলনামূলক শিক্ষার সংজ্ঞা

১. ম্যালিনসনের মতে, "By the expression comparative study of Education we mean a systematic examination of other cultures and system of education driving from these cultures in order to discover resemblances and difference, the causes behind and why variant solutions have been attempted to problems that are often common to all". অর্থঃ যথারীতি পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজ, কৃষ্টি ও তাদের শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনাই হলো তুলনামূলক শিক্ষা। এ অনুসন্ধান দ্বারাই বিভিন্ন জাতির শিক্ষার সাদৃশ ও বৈসাদৃশ এবং তার কারণ নির্ধারণ সম্ভব।

২. প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আই এল. ক্যান্ডেলও এ বিষয়ের অর্থ সম্পর্কে বলেন, "যেসব কারণ, শক্তি ও উপাদান কোন সমাজের কৃষ্টিকে রূপদান করে এবং যেসব শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার অধ্যয়নই তুলনামূলক শিক্ষা"।

৩. মাইকেল স্যাডলার এর মতে, "In studding foreign systems of education we should not forget that things outside the schools matter even more than the things inside the schools. A national system of education in living things, the outcome of forgotten struggles and difficulties and of battle long ago. It has in some the secret workings of national life". অর্থঃ যেকোন শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় বহির্ভূত বিষয় ও পরিবেশ বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘকালীন সংগ্রামের মাধ্যমে গতিশীল হওয়ায়, জাতীয় জীবনের গভীরে প্রবেশ করে।

৪. মার্ক এন্টনী জুলিয়েনের মতে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে করে গড়ে তোলার জন্যই বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনার প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়, Education and other sciences, is based on facts and observations, which should be ranged in analytical tables, easily compared in order to deduce principles and definite rules.

৫. অধ্যাপক এডমন্ড এফ কিং এর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুলনামূলক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে না। পরিবর্তনশীল মানুষকে ঠিকমত বুঝা না গেলে বিবর্তনবাদী শিক্ষাকে বুঝান কঠিন। বিশ্ব শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আলোচিত, বিবেচিত এবং পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

৬. কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ বিয়ারডের মতে, বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যেসব সাদৃশ ও বৈসাদৃশ থাকে এবং তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক দোষ-গুণ বর্তমান, তাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করাই তুলনামূলক শিক্ষার কাজ। প্রকৃতপক্ষে মৌল নীতিগত দিক থেকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্চাই হলো তুলনামূলক শিক্ষা।

৭. জে. এফ. ক্রেমার এবং জি. এস. ব্রাউনের মতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে দেশে পার্থক্য এবং অনগ্রসরতার কারণ যেমন অনুসন্ধান প্রয়োজন তেমনি এর পর্যালোচনাও। কারণ যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সেদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত।

৮. জার্মান অধ্যাপক ফ্রেডরিক স্লাইডার এর মতে, দেশের শিক্ষার স্বরূপ এবং কাঠামো নির্ভর করে ঐ দেশের জাতীয় চরিত্র, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক পটভূমি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্ম, ইতিহাস ও বৈদেশিক প্রভাবের ওপর।

৯. অধ্যাপক নিকোলাস হানসের মতে, যে জাতীয় চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, সেই জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় জাতিগত ও ভাবগত সংমিশ্রণের, ধর্মীয় আন্দোলনের এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পারস্পরিকতার মধ্য দিয়ে।

তুলনামূলক শিক্ষা সংজ্ঞার পর্যালোচনা

বিভিন্ন দেশের বহু শিক্ষার উপাদান শুধু একত্রিত করলেই কোন দেশের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় জীবনের গভীরে প্রবেশ। সুতরাং স্যাডলারের দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলনামূলক শিক্ষা হলো এমন একটি অধ্যয়নের বা পরিচর্চার বিষয় যার সাহায্যে জাতীয় বৈশিষ্ট ও সত্তার ওপর ভিত্তি করে আমরা বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা এবং তদারক করে নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। স্যাডলারই তুলনামূলক শিক্ষার প্রথম নির্দেশক। ক্যান্ডেলের ভাষায়, "The purpose of comparative education, as of comparative law, comparative literature or comparative anatomy is to discover the differences in the forces and causes that produce difference in educational systems". সুতরাং ক্যান্ডেলের মতে, যেসব কারণ, শক্তি ও উপাদান কোন সমাজের কৃষ্টিকে রূপদান এবং যেসব শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ সেসবের অধ্যয়নই তুলনামূলক শিক্ষা।

ম্যালিনসন তুলনামূলক শিক্ষা বলতে ক্যান্ডেলের ধারণাই প্রায় পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, নিয়মানুগ পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাজ, কৃষ্টি ও তাদের শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনাই তুলনামূলক শিক্ষা-যা বিভিন্ন কৃষ্টির শিক্ষার সাদৃশ ও বৈসাদৃশ এবং এসব সাদৃশ ও বৈসাদৃশ নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়।

শুধু বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়-ভবন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষাবৃত্তি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির বর্ণনা তার বাহ্যিক রূপদান করে। প্রাসাদ তৈরির জন্য যেমন ইট, সুরকীর প্রয়োজন তেমনি শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বর্ণনাও অধ্যয়নের জন্য আবশ্যক। কিন্তু প্রাসাদ তৈরি করতে হলে ইট, সুরকীর সংযোগ সাধনের জন্য সিমেন্ট দরকার। অনুরূপভাবে তুলনামূলক শিক্ষাকে যথার্থ রূপদানের জন্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনামূলক উপকরণ ও তথ্য ছাড়াও সংযোগ সাধনকারী উপাদান আবশ্যক। যেসব সামাজিক প্রভাব ও শক্তি বিভিন্ন দেশের শিক্ষা বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ক্যান্ডেল তাদের সংযোগ সাধনকারী উপাদান রূপে বিবেচনা করেন। এর প্রেক্ষিতে এ শিক্ষা অনুসন্ধানের বিষয় হলো, সামাজিক প্রভাব, শক্তি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দেশের শিক্ষার নানা দিকের মধ্যে যে সাদৃশ ও বৈসাদৃশ রয়েছে তা নির্ধারণ এবং বৈসাদৃশের কারণ অনুসন্ধান ও তুলনা করা। অধিকন্তু বিভিন্ন দেশ কিভাবে তাদের শিক্ষা সমস্যার সমাধান করে তা পর্যালোচনা করাও তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়নের বিষয়।

সুতরাং কোন বিশেষ দেশের বা বহু দেশের শিক্ষার বিভিন্ন দিকের তথ্যের বর্ণনা তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অর্থহীন হবে, যদি শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ দিকগুলো সৃষ্টি হওয়ার মূলে যেসব কারণ রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা না হয়। মূলত এ কারণে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনামূলক তথ্যসমূহকে উক্ত শিক্ষার মৌলিক উপাদান রূপে বিবেচনা করা হয়। যদি নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তার ভিত্তিতে এবং সেই দৃষ্টিকোণ হতে নিরক্ষরতা দমন অভিযান যেদেশ করে তাকে উক্ত পর্যায়ের অধ্যয়নের বিষয়রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিভাবে তিরিশ বছরের মধ্যে একটি বিরাট জাতির নিরক্ষরতা দূর করে বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয় তা সত্যিই এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। এ নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাফল্য অনুসন্ধান করতে হলে সোভিয়েতের রাজনৈতিক পটভূমিও জানার প্রয়োজন। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের সমাজতান্ত্রিক দর্শনকে বাস্তবায়নের ফলশ্রুতি হিসেবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি। এ নতুন দর্শন ও লক্ষ্যে সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার বাণী নিরক্ষর জনগণের নিকট পৌছান সম্ভব নয়। তাই নতুন আদর্শে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু এরপরও বিপ্লবোত্তর যুগের প্রতিকূল অবস্থা, গৃহযুদ্ধ প্রসূত অরাজকতা ও বিশৃংখলা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহা ক্ষয়ক্ষতি, প্রায় ২০ লক্ষ লোকের হত্যা, তেল বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রকল্প এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যেভাবে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হলো তা যথার্থই আশ্চর্যজনক। এ প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখযোগ্য যে, মূল রাশিয়ার ফেডারেশন ছাড়া রাশিয়ার এক বৃহৎ অংশে নিরক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৯০ হতে ১০০ ভাগ। সুতরাং পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দেখা যায়, সমগ্র দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন নতুন রাশিয়া সরকারের এক মহাকীর্তি।

অনুরূপভাবে থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের অগ্রগতির মূলে রয়েছে উক্ত শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সুতরাং প্রত্যেকটি সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য যেমন পর্যাপ্ত তথ্য দরকার তেমনি যথার্থভাবে তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি রূপে যেসব শক্তি, উপাদান ও গতি কাজ করে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর

এ শিক্ষার পরিসর বিশ্বব্যাপী। তবে এম. এড এর এক বছরের কোর্সের জন্য তা সীমাবদ্ধ। তাই এ কোর্সের স্বল্প সময়ের জন্য নির্বাচিত উন্নত ও উন্নয়নশীল ৬টি দেশের তথা বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, জাপান, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কাঠামো, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা প্রশাসন, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ শিক্ষার পরিসর সম্পর্কে সাত বিশেষজ্ঞের অভিমত নিম্নরূপঃ

১. স্লাইডার এর মতে, "শিক্ষার স্বরূপ ও কাঠামো নির্ভর করে দেশের জাতীয় চরিত্র, ভৌগোলিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক-বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক পটভূমি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, ইতিহাস ও বৈদেশিক প্রভাবের ওপর"। এসবের আলোচনা পর্যন্ত তার পরিসর।

২. এডমন্ড ডে. কিং এর মতে, তুলনামূলক শিক্ষা হলো এমন একটি অধ্যয়নের বিষয়-যা অনাগত ভবিষ্যতের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের পর্যক্ষেণ ও সিদ্ধান্তকে সুসংঘবদ্ধ করে। তিনি মনে করেন, বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ও শিক্ষামূলক সমস্যাবলি কোন একটি দেশের পক্ষে একা সমাধান করা সম্ভব নয়, এজন্য বিভিন্ন সমাজ, দেশ ও কৃষ্টির প্রতি যতদূর দৃষ্টি দেয়া যায় তা-ই এর পরিসর।

৩. জর্জ বিয়ারড এর মতে, "বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে সাদৃশ-বৈসাদৃশ থাকে এবং তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক দোষগুণ বর্তমান, তাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করাই তুলনামূলক শিক্ষার কাজ। প্রকৃতপক্ষে মৌলনীতি ভিত্তিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণই হলো তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর"।

৪. আই. এল. ক্যান্ডেলের মতে, "তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর শুধু শিক্ষার কাঠামো, সংগঠন, প্রশাসন, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির চর্চা বা অধ্যয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলির কারণ অনুসন্ধান এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের আলোকে ঐসব সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা সম্পর্কে অধ্যয়নও"। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ "The comparative study of education must be founded on the analysis of the social and political ideals which the school reflects, for the school epitomizes these for transmission and progress".

৫. জে. এফ. ক্রেমার এবং জি. এস. ব্রাউন এর মতে, তুলনামূলক শিক্ষার আওতায় দেশে দেশে শিক্ষার পার্থক্য ও অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধানের সাথে সাথে এসবের পর্যালোচনাও।

কেননা যে কোন শিক্ষাব্যবস্থা সেই দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন কোন দেশের সরকার যদি জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কঠোর শাসনাধীনে আবদ্ধ রাখতে চায়, তবে সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মৌল চরিত্রও হবে লক্ষ্য পূরণের সহায়ক মাত্র। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান শাসনমলে প্রণীত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৬. অধ্যাপক নিকোলাস হানসের মতে, "জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে জাতীয় চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে। আর এ জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠে জাতিগত ও ভাষাগত সংমিশ্রণ, ধর্মীয় আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে। সুতরাং শিক্ষার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে জাতীয় চরিত্র গঠনের এসব উপাদানের বিশ্লেষণও তুলনামূলক শিক্ষার আওতাভুক্ত"।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা যেমন অতীতকে অস্বীকার করতে পারে না তেমনি ভবিষ্যতের ওপরও এর ছায়াপথকে রুদ্ধ করতে পারে না। হানস পর্যালোচনা করে অবগত হন যে, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংস্কার, প্রথা, পরিবেশ এবং ইতিহাসের মধ্যে কিছু কিছু সংগতি রয়েছে, এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সেকারণে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সমস্যার ক্ষেত্রেও একটা অদ্ভূত সাদৃশ পরিলক্ষিত। এ কারণেই তিনি তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে মনে করেন।

৭. ফিলিপ ই. জোনস তুলনামূলক শিক্ষার পদ্ধতিকে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। শিক্ষার তাৎপর্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "Comparative education, which rapidly increasing resources and its hoses for better methods, seems admirably suited to provide a more rational basis for planning".

স্বীকৃত ছিল। তবে বর্তমান যুগের মানুষ বিজ্ঞানের সহায়তায় নিজের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বিধায়, সমাজের ভাগ্য উন্নয়নে এবং গতি নির্ধারণে আধুনিক মানুষের ভূমিকা অতীত অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। আবার অনেক দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে প্রায় ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। এ অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রত্যেকেরই যথাযোগ্য প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন।

সমাজের যেসব সংস্থা ব্যক্তিকে সমাজে বসবাসের উপযোগী প্রক্রিয়া দান করে তারমধ্যে শিক্ষা অন্যতম প্রধান। শিক্ষার এ প্রাধান্যের যুক্তিসঙ্গত কারণও বিদ্যমান। এ যুগে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সমাজ ব্যবস্থার সাফল্যের মূলে রয়েছে শিক্ষার অবদান। অবশ্য এক্ষেত্রে শিক্ষা অতীতের সংকীর্ণ অর্থে সীমিত নয়। আধুনিক সভ্যতার মূলে যেমন শিক্ষার নতুন ধারণা ও সম্প্রসারিত ভূমিকা রয়েছে, তেমনি সমকালীন যুগও তার প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষার এ ধারণাকে পরিবর্তন করে। অপরদিকে সমাজ তার ক্রমঅগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছে। সমাজের কার্য ও তার সমস্যাকে যেমন শিক্ষা হতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়, তেমনি শিক্ষা এবং তার সমস্যাকে সমাজের বহির্ভূত রাখাও সম্ভব নয়।

তুলনামূলক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্যকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নের প্রবণতা পরিলক্ষিত। পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশ এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে সম্মানজনক আসনের অধিকারী। তবুও এসব দেশের শিক্ষাবিদগণ আরো উন্নতমানের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী। বিশিষ্ট ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ এইচ. সি. ডেন্ট বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো পরিপূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং আমরা এখনও তা বাস্তবায়নের প্রতীক্ষায় রয়েছি"। তিনি এমতও পোষণ করেন যে, "পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে যুক্তরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে এইচ, রিডও বলেন, "ব্রিটেনের সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য "লিবারেটেরিয়ান গণতন্ত্র" অর্জন। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যের ধারণার সাথে ব্যক্তির স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রের সংমিশ্রণে এ প্রকারের গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ দলের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে,

কার্ল মার্কসের আদর্শ কমিউনিজম এখনও বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে এবং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদিগকে আরো কয়েক ধাপ অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বা তা অর্জনের পর শিক্ষা কিরূপ হবে তা নির্ধারণ করাও রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ। বিভিন্ন যুগ ও দেশের সমাজব্যবস্থা এবং দর্শনের সূত্র ধরে শিক্ষার উদ্দেশ্য, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বেশ জটিল হলেও এর চর্চা দ্বারা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সামাজিক ভূমিকা ছাড়াও শিক্ষা যে অন্যান্য অর্থে

ব্যবহৃত তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রগতিশীল চিন্তাবিদগণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশকেই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য মনে করেন এবং তাদের বিশ্বাস যে, এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হিসেবে সামাজিক চাহিদা শিক্ষায় প্রতিফলিত হবে। এ প্রেক্ষিতে এস. ভি. সি. জেফরীসের দুটি ধারণা রয়েছে-

1. "The aim of education in the nature of personal growth".
2. "Education is an instrument for conserving, transmitting and renewing culture". তিনি শিক্ষার দ্বৈত ভূমিকার ওপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্থাৎ এ দুই মন্তব্য অনুসারে শিক্ষা একাধারে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা দেয় এবং তৎসঙ্গে কৃষ্টির সংরক্ষণ, পরিচলন ও নতুনত্ব আনয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের সামগ্রিক জীবনই তার কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। এ ক্ষেত্রে কৃষ্টি বলতে ব্যক্তির, দলের এবং সমগ্র মানব জীবনের পরিবেশকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। মানুষ কতগুলো নৈপুণ্য অর্জন ও প্রয়োগ দ্বারাই তার কৃষ্টি সৃষ্টি করে। তার বিশ্বাস, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, নীতি, মনোভাব, মূল্যবোধ, সামাজিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নয়নের মান সবই তার সৃষ্ট কৃষ্টির প্রতীকরূপে প্রতিফলিত।

সমাজ বিজ্ঞানীগণ মানুষের সংস্কৃতির প্রতীক ও প্রকাশগুলোকে ভাবগত, সামাজিক ও কারিগরি-এ তিনভাগে বিভক্ত করেন। মানুষের বিশ্বাস, দর্শন ও ধর্ম কৃষ্টিরই ভাবগত দিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, আইন, প্রথা ও পাস্পরিক সম্পর্ক কৃষ্টির সামাজিক দিকের অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্টির কারিগরি দিক হলো মানুষের কর্ম সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী। মোটামুটিভাবে আমরা দেখি মানুষের আত্মিক, সামাজিক ও জাগতিক সর্ব প্রকারের চাহিদা তার কৃষ্টির মাধ্যমে বিকশিত ও প্রকাশিত হয়। আবার কৃষ্টি হতেই মানুষ নিজকে সমাজের উপযোগী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তুতি লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটি সুস্পষ্ট যে, কৃষ্টির বিকাশ, পরিচলন ও ধারাবাহিকতা রক্ষণে সকল ব্যক্তির ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। তবে কৃষ্টির মান উন্নয়নে ও সমৃদ্ধিকরণে ব্যক্তির যোগ্যতার প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। এ যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও কৃষ্টির মধ্যে যে নৈকট্যপূর্ণ সম্পর্ক তা শিক্ষায়ও প্রতিফলিত হয়। প্রত্যেক সমাজই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে অপরিণত বংশধরদের নিকট তার কৃষ্টির ঐতিহ্য ও ধারাকে চিরন্তন ধরে রাখতে চায়। সুতরাং কোন সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধ্যয়ন করে তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করা যায়।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণে শিক্ষা ও সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে উন্নয়নের গতিধারার দিক নির্দেশনায় শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মূল লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞতার

আলোকে নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীরভাবে উপলব্ধি, শিক্ষা ত্রুটির গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নে তথ্য সংগ্রহ ও এর যথাযথ ব্যবহার করা। তাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জন করা আবশ্যক। এ তুলনামূলক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

১. **বুদ্ধি দীপ্তমূলক ঃ** কার্যত তুলনামূলক শিক্ষা একটি জ্ঞানচর্চার বিষয়। অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বুদ্ধদীপ্ত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও উপলব্ধিকে পরিপূর্ণ ও উন্নত পূর্বক তার অন্তর্দৃষ্টি যথাযথভাবে বিকশিত করতে হবে, যেন সে ঐসব দেশের জনগণ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। এতে শিক্ষা বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞানের বিকাশ ও প্রয়োগের পথ খুলে যাবে।

২. **পরিকল্পনামূলক ঃ** বর্তমান সব দেশেই সমৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন পরিকলপনা প্রণয়ন করে। শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিটি দেশ নতুন নতুন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এসব নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন রূপ দুর্বলতা বা শৈথিল্য প্রদর্শনের অবকাশ নেই। কারণ এর সাথে প্রতিটি নাগরিকের উন্নতি ও বিকাশ জড়িত। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত ত্রুটিমুক্ত ও পরিপক্ক হতে হবে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষা সুসংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য প্রদানে সহায়ক। এ প্রসঙ্গে জোনস বলেন ঃ "Comparative education, with its rapidly increasing resources and its hopes for better methods, seems admirably suited to provide a more rational basis for planning".

৩. **উপযোগিতামূলক ঃ** বর্তমানে প্রায় দেশেই শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য প্রতিষ্ঠিত। চিন, জাপান ও কোরিয়ার মত কিছু দেশ কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনকে শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা এবং নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিও সাধন করে। পক্ষান্তরে ভারত ও বাংলাদেশের মত অনেক দেশই শিক্ষাকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপায় হিসেবে গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রসার এমনভাবে বৃদ্ধি করেছে এবং করছে যাতে বেকার সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠেছে ও ওঠছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যে, বিকাশ করছে তা শেষ পর্যন্ত উন্নত দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে, অর্থাৎ দরিদ্র দেশগুলোর ব্যয়ের অনেকটা সুফল ভোগ করছে উন্নত দেশ। এসব সমস্যার সমাধানে তুলনামূলক শিক্ষার আলোকে শিক্ষার প্রয়োগশীলতা ও উপযোগিতার বিষয়টি একান্তভাবে বিবেচ্য।

৪. **উদ্ভাবনীমূলক ঃ** প্রতিটি দেশেই শিক্ষাক্ষেত্রে আজকাল অনেক উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচির প্রবর্তন হয়েছে। শিক্ষার নতুন নতুন প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের ব্যবহার, মডিউলার পদ্ধতি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি আমাদের জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার ঘটাচ্ছে। তুলনামূলক শিক্ষা পরিচর্চার মধ্য দিয়ে উন্নত দেশসমূহে বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিখন-শেখানো পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষে

পাঠদান, শিক্ষকের আচরণগত উন্নয়ন ইত্যাদি দেশসমূহ যথাযথ জ্ঞান ও ধারণা গ্রহণ না করলে এসব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কালক্রমে ব্যর্থ হবে। সুতরাং অনেক সময় পরীক্ষা ও ভ্রান্তি নিরসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের চেয়ে অন্যদেশের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোই শ্রেয়।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভূমিকাঃ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হয়। আর দেশের উন্নয়নও সেসব নীতির ওপর নির্ভরশীল। যেকোন দেশে যেসব শিক্ষানীতি প্রণীত হয় তা সেদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। আবার এ শিক্ষানীতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ–

ক. জাতীয়তাবাদ
খ. সমাজতন্ত্র (সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারে)
গ. গণতন্ত্র
ঘ. মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

এসব মুলনীতি থেকে উদ্ভূত আরও কিছু উপমূলনীতি রয়েছে। যেমন-

ক. দেশের অনগ্রসর মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত
খ. নগর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ
গ. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার উন্নতি
ঘ. সুযোগের সমতা বিধান
ঙ. কর্মের অধিকার প্রদান
চ. জাতীয় সার্বভৌমত্ত ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা
ছ. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন
জ. গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি

শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ ও ভবিষ্যত সমাজ গঠনের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণির জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং বাঞ্ছিত নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য এদেশের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার মূলনীতির সাথে এ সাংবিধানিক নীতিমালার যোগসাধন করে বাংলাদেশের যেসব জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা হয়েছে তাহলোঃ

ক. **দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ত ঃ** প্রত্যেক নাগরিকের নিজের দেশকে অবশ্যই ভালবাসা উচিত। এ ভালবাসা বা দেশপ্রেম বলতে কোন সুস্পষ্ট ভাবাবেগপূর্ণ অনুভূতির কথা বোঝায় না, বাংলাদেশের আদর্শের যথার্থ উপলব্ধির কথাই বোঝায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় ঐতিহ্যে গর্ববোধ, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী হওয়া এবং তার ভবিষ্যত সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা পোষণ করা। দেশপ্রেমের মূল মর্ম

হচ্ছে, প্রত্যেক নাগরিক জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এবং জনগণের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্ম হয়ে ওঠবে। অনুভব করবে পরিবারের সদস্যের মত সে দেশের একজন এবং দেশের ভাগ্যে ভালমন্দ যা কিছুই ঘটে তা যেন তার নিজের ভাগ্যের ওপরই ঘটে।

সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং সমাজের প্রগতিশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টি রাখতে হবে, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণ চেতনায় দেশপ্রেমিক নাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ, সাম্য, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, শ্রমের মর্যাদা, চরিত্র গঠন, গণমুখী শিক্ষা, কর্মকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতির প্রতি শিক্ষার্থীর চিত্তে এক মমত্ববোধ জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে এবং বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

খ. **জাতীয়তাবাদঃ** ইতিহাস, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের জ্ঞান, সংস্কৃতিচর্চা এবং মাতৃভাষা সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় ও সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বাংলাভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যাতে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধ সংহতভাবে প্রসারিত হয়। আর তাই গোষ্ঠী চেতনার উর্ধ্বে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সবার জন্য একই শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা উচিত।

গ. **সমাজতন্ত্রঃ** সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন আবশ্যক। সেজন্য সমাজের চেতনা জগতেও আমুল পরিবর্তন আনতে হবে। জনগণের মনে সেই সচেতনতা প্রতিষ্ঠিত করা শিক্ষানীতির লক্ষ্য বলে স্থির করতে হবে। সমাজতন্ত্র উত্তরণের প্রাথমিক শর্তরূপে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকতাবোধ এবং অধিকারবোধের সাথে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণার্থে জ্ঞান আহরণ, নৈপুণ্য অর্জন এবং জাতীয় ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা।

ঘ. **গণতন্ত্র ঃ** গণতন্ত্রে সমাজের সবার অধিকার ও কর্তব্য সমান, যা সর্বজন স্বীকৃত। তাই এ অধিকারের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করা দরকার। মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, মানব সত্তার মর্যাদাবোধ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে নির্ধারিত হয়, তার সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও সঠিক ধারণা সকল শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলো শিক্ষার্থীদের মনে জাগ্রত করা প্রয়োজন।

ঙ. **ধর্মীয় সহনশীলতা ঃ** রাষ্ট্রের ধর্মীয় নীতি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করে। এ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমন্নিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা করাই হবে শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট।

চ. **মানবতা ও বিশ্ব নাগরিকত্ব ঃ** জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে শোষণহীন নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সকল সংগ্রামী জনগণের প্রতি বন্ধুত্ব ও একতার হস্ত প্রসারিত করতে হবে। মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ ও প্রীতি এবং মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

ছ. **নৈতিক মূল্যবোধ ঃ** শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সে সর্বদা সত্যের পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়, সেবিষয়ে নজর রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষাক্রমে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশে তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষকতায় যাতে বহু প্রত্যাশিত উচ্চ নৈতিক মান সৃষ্টি হয় সেজন্য সত্যিকার পাণ্ডিত্য ও নিপুণ শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে শিক্ষকদের সততা, নিরপেক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম এবং শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিকতা অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐক্যবোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে যে পরিকল্পনা, উদ্যম ও সাহসিকতার প্রয়োজন, শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে এসব গুণ উন্মেষের জন্য অবশ্যই নিষ্ঠার সাথে ব্রতী হতে হবে।

জ. **সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা ঃ** দীর্ঘ দিনের শোষণ জর্জরিত সমাজের দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়ার রূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানপূর্বক জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি স্তরে সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে। পাশাপাশি একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় সকল বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টিরও বন্দোবস্ত করতে হবে। নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতি অবসানের অনুকূল বিজ্ঞানমুখী, আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। এজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি ন্যূনতম মান পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ঝ. **জাতীয় অর্থনীতির অনুকূল প্রয়োগমুখী শিক্ষা ঃ** দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির মহান দায়িত্ব শিক্ষাব্যবস্থার। আমাদের দেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত জাতির তুলনায় অনেকটা কম। তাই জাতি হিসেবে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি সামাজিক পুঁজি বিশেষ। সেজন্য একটি দেশের সব স্তরের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজনের ফলেই জাতীয় সম্পদের ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব। সে অগ্রগতিকে গতিশীল করার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী

করে তোলা প্রয়োজন। আমাদের সম্পদ সীমিত হলেও বিপুল জনশক্তি রয়েছে যা কর্মে নিয়োজিত হলে এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন করলে অনিবার্যভাবে জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের শিক্ষা ও উপযুক্ত দক্ষতা দানের সেই ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায়।

কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতির অনেকটা ব্যবহার আজও সারাদেশে বিদ্যমান। কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধন করে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হলে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ও সার্থক উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব করে তুলতে হলে কৃষি ও বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিষয়ক প্রশিক্ষণকে অর্থপূর্ণ করতে হবে। আর নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী পরিকল্পনা ও উচ্চমানের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগাবার দৃঢ় প্রত্যয়সহ সংকল্পবদ্ধ বিশেষজ্ঞ অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।

ঞ. **শ্রমে মর্যাদাবোধ ঃ** জাতি হিসেবে আমাদের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে হাতের কাজের প্রতি অনীহা ও শ্রমের মর্যাদাদানে দ্বিধাবোধ। এ ধরনের মানসিকতা বিদ্যমান থাকলে দেশের গঠনমূলক উন্নয়নকর্মে মন্থর গতি হতে বাধ্য। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক যে যে কাজের জন্য উপযুক্ত তাকে সেক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনও অত্যাবশ্যক।

ট. **কুশলী জনসম্পদ সৃষ্টি ঃ** কুশলী জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগমুখী মানসিক শ্রমের সাথে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে। আর কৃষি, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে। যেসব বয়স্ক কর্মজীবী ইতোপূর্বে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাঁদেরও শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমদক্ষতা ও মানসিক গুণাবলী উন্নয়নের সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

ঠ. **নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা ঃ** পরাধীনতার যুগে যেভাবে অনুকরণ প্রবণতা, আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতা লালন করা হত, সে অবস্থার দ্রুত অবসান প্রয়োজন। নতুন সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়-উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য তারুণ্যের সৃজনশীলতা ও কর্মশক্তির যথাযথ মর্যাদাদান এবং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রূপায়ণের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে একটি গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে-যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস,

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান শিক্ষার অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজননের সাথে সাথে শিক্ষাকে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞান প্রবাহের তুল্যমানে উন্নতি করতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ রেখে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও শিক্ষানীতি প্রণয়নকালে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ও ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশও কমিটি পর্যালোচনা করে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ

১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ত ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তাচেতনায় দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

৪. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্ম সংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করা।

৬. বিশ্বভ্রাতৃত্ত, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ সৃষ্টি এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৭. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

৮. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।

৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

১০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১১. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সমান সুযোগসুবিধা অবারিত করা।

১২. শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা।
১৩. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।
১৪. পরিবেশ সচেতনা সৃষ্টি।

ভারতের শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কোঠারি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। ১৭টি দফার এ ঘোষণার মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে তাহলো–

১. সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি কার্যকর করা।
২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ নির্বিশেষে শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।
৩. নারী, শিক্ষা, সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রচলন করা (বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের জন্য)।
৪. জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতি বিকাশ সাধনে তিন-ভাষা সূত্রের প্রয়োগ করা। অর্থাৎ স্কুল স্তরের শিক্ষায় অহিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে-মাতৃভাষা, ইংরেজি ও হিন্দী এবী হিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে-হিন্দী, ইংরেজি এবং অন্য একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (সম্ভব হলে একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা)।
৫. কল্যাণমূলক ও কর্ম অভিজ্ঞতায় বাধ্যতামূলকভাবে সব শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।
৬. শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত বেতন, সামাজিক সম্মান ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
৭. অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার জন্য বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।
৮. শিক্ষার জন্য ক্রমপর্যায়ে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি উপযুক্ত জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের লক্ষে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে Challenge of Education-A policy perspective ঘোষণায় শিক্ষার যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিধৃত করে তা নিম্নরূপঃ

১. মেধা ও মননের সব ক্ষেত্রে নবতর জ্ঞানের বিকাশ সাধন।
২. উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিরাজিত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ সাধন।
৩. ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর উপলব্ধি বিকাশে সহায়তাকরণ।
৪. ব্যক্তির আর্থ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ, যোগ্যতা ও সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষে-
   ক. ব্যক্তিত্বের দৈহিক, মানসিক ও নান্দনিক দিকসমূহের বিকাশ সাধন।
   খ. গণতান্ত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিস্ফুটন।

গ. অজানা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও উদ্ভাবনের জন্য আত্মবিশ্বাস জাগতকরণ।
ঘ. প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
ঙ. কঠোর পরিশ্রম এবং শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ সাধন।
চ. ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতির প্রতি নিবেদিতকরণ।
ছ. দেশের অখণ্ডতা, সম্মান ও অগ্রগতির স্বার্থ উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য নিবেদিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার উন্নয়ন।

৫. বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের তত্ত্ব, তথ্য ও জ্ঞানের বিকাশ সাধন এবং ভাষা যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের পাশাপাশি খেলাধুলা এবং আমোদ প্রমোদের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি।
৬. দেশের অগ্রগতির ধারা ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা প্রদান।
৭. শিক্ষার বিস্তার এবং মানোন্নয়ন যাতে ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে নারী পুরুষ প্রত্যেকেই নিজকে সর্বোচ্চ বিকাশের সুযোগ পায়।
৮. সহনশীলতা ও অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেয়া।
৯. শিক্ষার সাথে সমাজের যোগসূত্র স্থাপন।

ইংল্যান্ডের শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইংল্যান্ডের লোক রক্ষণশীল হলেও প্রগতিবাদের প্রতি তারা কখনও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে না। তাদের মধ্যে রয়েছে অদম্য মনোভাব এবং স্বাধীনতাবোধ। তবে রাষ্ট্রের আনুগত্যবোধ থাকলেও স্বাধীনতাবোধের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য নয়। তাই বহুকাল অবধি ইংল্যান্ডের শিক্ষা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে ছিল এবং এখনও তা সর্বব্যাপী নয়।

ইংল্যান্ডের জাতীয় চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হলো ধর্মবোধ। এ কারণেই ইংল্যান্ডের শিক্ষার বিবর্তনে ধর্মীয় সংস্থাসমূহের প্রভাব অপরিসীম। একদিকে জনগণের রক্ষণশীলতা, স্বাধীনতা ও ধর্মীয়বোধ, অন্যদিকে প্রগতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য-এসবেরই প্রতিফলন ঘটে। তাদের শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্রপোষিত বিদ্যালয় এবং চার্চ পোষিত বিদ্যালয়ে দীর্ঘকালে সংঘর্ষের আপোষ মিমাংসা অথবা স্বশাসিত বিদ্যালয় এবং পাবলিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আপোষ মিমাংসা। বস্তুত ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা আইন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত জাতীয় ভিত্তিতে যেসব শিক্ষা আইন বা নীতি প্রণীত সেগুলোর মধ্যে কমবেশি ইংল্যান্ডের এ জাতীয় চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা আইনে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় ঃ To provide such variety of instruction and training as may be desirable in view of their different ages, abilities and aptitudes and of the different periods for which they may be expected to remain at school including practical instruction and

training appropriate to their respective needs. অর্থঃ কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষকদের এমন সব নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে নিজেদের সামর্থ ও প্রবণতা অনুযায়ী নানা পর্যায়ে তাদের যথাযথ চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।

বর্তমানে ইংল্যান্ডের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো কর্মমুখী ও জীবন উপযোগী জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। এ লক্ষ্যের আলোকে ইংল্যান্ডের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ–

ক. শিশুদের সুন্দর জীবন শুরু করার পরিবেশ উপহার।
খ. শিশুদের জন্য একটি সুখময় শৈশব নিশ্চিত করা।
গ. সব রকম প্রতিভার অধিকারী শিক্ষার্থীদেরকে সুযোগ প্রদান করা, যাতে তারা তাদের যোগ্যতানুযায়ী উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে পৌছতে পারে।
ঘ. যুবকদের জন্য শিক্ষার সার্বিক সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তারা উন্নতির শীর্ষে পৌছার জন্য আত্মনিয়োগ করতে পারে।
ঙ. শিক্ষার্থীরা যেন মানুষ হয়ে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে আত্মপরিচয় দিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় উত্তরাধিকার সৃষ্টি।

মালয়েশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতি এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

একটি একক ও সমতাভিত্তিক উন্নত, গণতান্ত্রিক এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনই মালয়েশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করেই ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে "রাজ্জাক কমিশন" রিপোর্ট প্রকাশিত-যার ভিত্তিতে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা আইন পাশ হয়। এ কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, "এ দেশের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হবে দেশের সকল জাতি ও গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের একটি একক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আনা এবং এক্ষেত্রে জাতীয় ভাষা তথা মালয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে"।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতে এটি সহজেই অনুমেয় যে, মাতৃভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার আলো পৌছে দেয়াই হবে শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের অধ্যাদেশ অনুযায়ী মালয়েশিয়ায় দুই ধরনের স্কুলের প্রবর্তন হয়। যেমন ইনডিপেনডেন্ট স্কুল এবং এসিসটেড স্কুল। এসিসডেট স্কুলে মালয়, ইংলিশ, চাইনিজ, তামিল ভাষা শেখানো হয়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে মালয় এবং তামিল ভাষা বাধ্যতামূলক। স্কুলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বোর্ড অব গভর্নরস, স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ইনসপেক্টরেট গড়ে ওঠে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে নতুন শিক্ষা কমিশন "আব্দুর রহমান তালিব কমিটি" গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এ কমিটি শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইনের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়। এ কমিটির কতিপয় সুপারিশ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্ট অনুমোদন দেয় এবং তা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা আইনের সাথে যোগ করা হয়। এ নতুন নীতির ফলে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত দেশের প্রধান চারটি ভাষায় যেমন-মালয়, ইংলিশ, চীনা এবং তামিল ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়। সকল স্কুলে মালয় এবং ইংলিশ বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে রাখা হয়।